জমি অধিগ্রহণে সরকারের জড়িত থাকা দরকার

ছ'বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁরা। সেই আলোচনার সূত্র ধরে রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন আলোচনা করেছেন ন'জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ: **অশোক সঞ্জয় গুহ, মৈত্রীশ ঘটক, মৃণাল দত্ত চৌধুরী, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বর্ধন, কৌশিক বসু, মুকুল মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়** এবং **দেবরাজ রায়।** *প্রথম পর্ব।*

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের যে উদ্যোগ শুরু করেছে তার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ হয়েছে, তার পরিণামে ব্যাপক হিংসা এবং প্রাণহানি ঘটেছে। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের নাম এখন কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে, এমনকী বিদেশেও লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের জন্য কী করণীয়, সে বিষয়ে আমরা অতীতে লিখেছি। (*আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৭-২১ জুন, ২০০১; *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি,* ১২ অক্টোবর, ২০০২) সেই আলোচনার সূত্র ধরে এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আমরা এই বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

আমরা অবশ্যই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চের ঘটনার নিন্দা করি। পুলিশ এবং শাসক দলের ক্যাডাররা সে-দিন যে ভাবে জমি অধিগ্রহণের বিরোধী কৃষিজীবীদের ওপর আক্রমণ করেছে, তাদের খুনজখম করেছে, তার নিন্দার ভাষা নেই। যত প্ররোচনাই থেকে থাকুক, মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন ঘটনা সর্বতোভাবে অন্যায়। এ নিয়ে কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না।

কিন্তু শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিবাদ বা সংঘাত কোনও অচেনা ব্যাপার নয়। চিনে কেবল ২০০৫ সালেই বিভিন্ন এলাকায়, সরকারি মতেই, ষাট হাজারের বেশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বহু ক্ষেত্রে শিল্প বা আবাসন প্রকল্পের জন্য কৃষি জমি নেওয়ার উদ্যোগকে কেন্দ্র করেই এই সব সংঘর্ষ।

পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা আরও জটিল। এক দিকে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে এই রাজ্যের বিরোধী পক্ষ চরম অদূরদর্শী এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে চলেছে, অন্য দিকে রাজ্য সরকার চূড়ান্ত প্রশাসনিক অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়েছে। পার্টির স্থানীয় গুণ্ডারা নন্দীগ্রামে তাদের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠলে এবং দীর্ঘ দিন ধরে নির্মম দমন নীতি প্রয়োগে অভ্যস্ত পুলিশ তাদের মদত দিতে মাঠে নামলে কী পরিণাম হতে পারে, তা অনুমান করা খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়।

কেন সরকার

নন্দীগ্রামে যা ঘটেছে, তা নিশ্চয়ই ভারতের অন্য জায়গাতেও ঘটতে পারে (এক অর্থে ওড়িশার কলিঙ্গনগরে তা ঘটেও গেছে)। যেখানে জমি অধিগ্রহণে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকে, সেখানেই এমন ঘটনার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের ঘটনার পরিণামে যদি সরকার শিল্পের জন্য জমি সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চায়, সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে। কেউ কেউ তেমন পরামর্শ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির (এস ই জেড) ক্ষেত্রে এ রকম সিদ্ধান্তও নিয়েছেন।

অন্তত চারটি কারণে আমরা মনে করি, বেসরকারি ক্রেতা সরাসরি জমি কিনে নিতে গেলে নানা সমস্যা হতে পারে, নানা অবাঞ্ছিত পরিণাম দেখা দিতে পারে, তাই জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় সরকারের জড়িত থাকা দরকার।

প্রথমত, অনেক সময়েই কৃষিজমি কিনে শিল্পনির্মাণ বা আবাসনের কাজে লাগাতে পারলে বিপুল লাভ করার সুযোগ থাকে, কারণ শিল্পোদ্যোগী (বা প্রোমোটার) সংশ্লিষ্ট কৃষিজীবীদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়ে দিয়ে ন্যায্য দরের চেয়ে অনেক কম দামে জমি কিনে নিতে পারেন। তাঁদের এই লাভের একটা অংশ স্থানীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য আহরণ করে নেওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সম্পত্তি কেনাবেচার ফলে যে লাভ হয় তার উপর কর (ক্যাপিটাল গেনস ট্যাক্স) বসিয়ে এটা করা যেত, কিন্তু আপাতত সেটা বাস্তবে সম্ভবপর নয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত কৃষিজীবীদের হয়ে রাষ্ট্র যদি জমির ক্রেতার সঙ্গে বোঝাপড়া করে, সেটাই আপাতত সবচেয়ে ভাল উপায়।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা (জমির) মালিক নন, তাঁদের সঙ্গে কোনও কর্পোরেট ক্রেতা কেনাবেচা নিয়ে কথা বলতে চাইবেন না। অথচ কৃষিজমির মালিক ছাড়াও অনেকেই জমি থেকে জীবিকা সংগ্রহ করেন, সুতরাং জমি অধিগ্রহণের সময় তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। (এ প্রসঙ্গে আমরা ফিরে আসব।) রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চালানো হলে এই সমস্যাটিকে শুরু থেকেই এড়ানো যায়।

তৃতীয়ত, একটা উল্টো সমস্যাও হতে পারে। অল্পসংখ্যক বিক্রেতা জমির ক্রেতাকে আটকে দিতে পারেন, অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন যেখানে তাঁর বিনিয়োগ করে লাভ নেই। ধরা যাক, একজন বিনিয়োগকারী একটি এলাকায় যে জমি কিনতে চান তার অধিকাংশই জমির মালিকদের কাছ থেকে কিনে ফেলেছেন। যে কয়েক জন তখনও বিক্রি করেননি, তাঁরা বিপুল দর হাঁকতে পারেন, কারণ তাঁরা জমি না ছাড়লে বাকি জমিটাও কাজে লাগানো যাবে না। বিশেষ করে ক্রেতা যদি একটি অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড দখলে পেতে চান, তা হলে মাঝখানে কোথাও এক টুকরো আলাদা জমি থাকলে চলে না। এই অবস্থায় ওই অল্প কিছু জমির মালিক হয়তো এমন চড়া দর চাইলেন যে বিনিয়োগকারীর সামগ্রিক প্রকল্পের লাভক্ষতির হিসেবটাই বরবাদ হয়ে গেল। তার ফলে সম্ভাব্য অন্য বিনিয়োগকারীরাও আর ওই অঞ্চলে লগ্নি করতে আসবেন না। (ক্রেতা হয়তো গুণ্ডা লাগিয়ে অনিচ্ছুক বিক্রেতাকে উৎখাত করতে তৎপর হবেন, কিন্তু সেটাও তো কাম্য নয়।)

চতুর্থত, যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার। (যেমন, কোনও এলাকায় একাধিক খারাপ রাস্তার চেয়ে একটি ভাল রাস্তা থাকা ভাল।) এই সমন্বয়ের কাজটিতে সরকারের ভূমিকা জরুরি। কারণ, পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব সাধারণত সরকারের, সেই পরিকাঠামো অনুসারে সরকার কোথায় কী ধরনের বিনিয়োগ হবে তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখতে পারে। তা না হলে, বিনিয়োগকারীরা যে যার ইচ্ছামত জমি কিনে কারখানা বা আবাসন গড়ে ফেললে মুশকিল।

আমরা মনে করি, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এই গোলযোগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য কোনও রাজ্যের সরকার যদি শিল্পায়নের উদ্যোগ ছেড়ে দেয়, সেটা হবে দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যজনক। তার কারণ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে, কৃষির ফলন থমকে গেছে। এই অবস্থায় শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। আমরা পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা অবশ্যই চাইব যে শিল্পায়ন যথাসম্ভব দরিদ্রের স্বার্থের অনুকূল হোক। কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, যে শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, যেমন কাপড়ের কল বা ফুড প্রসেসিং শিল্প, সেগুলি তৈরি না করে রসায়ননির্ভর শিল্প বা মোটরগাড়ির কারখানা কেন? প্রশ্নটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের দৌড়ে এতটাই পিছিয়ে আছে যে খুব বেশি বাছাবাছি করার সুযোগ বোধহয় তার নেই। তা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন রাজ্য নিজের এলাকায় বিনিয়োগ আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সুতরাং রাজ্য সরকারকে অনেক বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।

স্বচ্ছতার দাবি

তবে প্রস্তাবিত বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পের কোনটিতে কত কর্মসংস্থান হতে পারে, সে বিষয়ে যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই স্বচ্ছতা দাবি করব। প্রকল্পগুলি থেকে কী কী লাভ হবে, সেই লাভের জন্য কী মূল্য দিতে হবে, বিনিয়োগকারীদের কী ভাবে কতটা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, সে সব বিষয়েও সবাইকে সব কিছু পরিষ্কার করে জানানো দরকার। দীর্ঘমেয়াদি বিচারে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া দরকার পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের উপর, যাতে বিনিয়োগকারীদের চোখে পশ্চিমবঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

ইদানীং আর একটি কথা খুব শোনা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে আদৌ কোনও কৃষিজমি শিল্পের জন্য নেওয়া উচিত নয়, শিল্প তৈরি করতে হবে কেবল পতিত জমিতে কিংবা যে জমিতে চাষ হয় না সেখানে। এই প্রস্তাব, অন্তত আপাতত, খুব বাস্তবসম্মত নয়। ঘটনা হল, যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত উর্বর, যেমন বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, সাধারণত সেই সব জায়গাতেই রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিসংযোগ, বন্দর বা বিমানবন্দরের সঙ্গে সহজে যোগাযোগের সুব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামোর হাল তুলনায় ভাল। পুরুলিয়া বা পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো যে সব অঞ্চলে অনেক অব্যবহৃত জমি আছে, সেখানে পরিকাঠামোর খুবই দুর্দশা। এই সব অনগ্রসর এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা নিশ্চয়ই জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এখানে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু এখনই কাজ শুরু করলেও সে জন্য অনেকটা সময় লাগবে। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যে সব শিল্প প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলির জন্য মোট যত জমি দরকার, সেটা রাজ্যের সামগ্রিক কৃষিজমির এক শতাংশেরও কম।

আসল কথা হল, শিল্পায়নের পথে এমন ভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে গ্রামবাসীরা বিপন্ন না হন। বস্তুত দেখতে হবে, শিল্পায়নের সুফলগুলির ন্যায্য অংশ যেন তাঁদের হাতে পৌঁছয়। এটা কিন্তু আপনাআপনি ঘটবে না। নতুন নতুন প্রকল্পে কর্মসংস্থান হবে ঠিকই, কিন্তু সেই কাজ গ্রামের মানুষের নাগালে আসবে কি? নন্দীগ্রামের খুব কম লেখাপড়া জানা কৃষিজীবী মানুষ যদি আশঙ্কা করেন যে তাঁদের জমিতে (আগের প্রস্তাব মাফিক) রসায়ন শিল্পের কেন্দ্র তৈরি হলেও সেখানে তাঁর মতো মানুষের কোনও কাজের সুযোগ হবে না, তাঁর আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়।

দীর্ঘমেয়াদি বিচারে, মানুষের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। এ ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে আছে। যদি তা হত, যদি রাজ্যের গড়পড়তা গ্রামবাসী নতুন সম্ভাবনাময় শিল্পের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারতেন, তা হলে সেই শিল্পে তাঁদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ত, তার ফলে শিল্পায়নের প্রতি তাঁদের মনোভাব অনেক বেশি অনুকূল হত। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ গ্রামবাসীর দক্ষতা বাড়ানোর কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার। কিন্তু আপাতত যথাযথ ক্ষতিপূরণের উপরেই জোর দিতে হবে।

এই সমস্যা গোটা দেশেই আছে। নর্মদা প্রকল্পের ইতিহাসই তার বড় প্রমাণ। ভারতে ভূমিচ্যুত মানুষের ক্ষতিপূরণের যে নীতি অনুসরণ করা হয়, তা নিতান্তই মান্ধাতা আমলের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতি তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সাধারণ মানুষের মঙ্গলের দিকে তারা মোটেই নজর দেয়নি। এটা মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারটি খেয়াল করেছে। ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের ধারায় এই সরকার আটকে থাকেনি। প্রথমত, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নথিভুক্ত বর্গাদাররা জমির মালিক না হলেও তাঁদের ক্ষতিপূরণের আয়োজন করেছে, কারণ কৃষিজমি চলে গেলে তাঁদের জীবিকাও চলে যায়। কিন্তু কী পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা করা হয়নি। এ বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব। *(চলবে)*

***অশোক সঞ্জয় গুহ**, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; **মৈত্রীশ ঘটক**, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স; **মৃণাল দত্ত চৌধুরী**, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স; **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; **প্রণব বর্ধন**, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; **কৌশিক বসু**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **মুকুল মজুমদার**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**, বস্টন ইউনিভার্সিটি; **দেবরাজ রায়**, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি*

চাই ক্ষতিপূরণের সুব্যবস্থা, আর বিশ্বাসযোগ্যতা

ছ'বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁরা। সেই আলোচনার সূত্র ধরে রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন আলোচনা করেছেন ন'জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ: **অশোক সঞ্জয় গুহ, মৈত্রীশ ঘটক, মৃণাল দত্ত চৌধুরী, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বর্ধন, কৌশিক বসু, মুকুল মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়** এবং **দেবরাজ রায়**। *দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব।*

শিল্পায়ন বা অন্যান্য প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ কী পদ্ধতিতে দেওয়া হবে? এখানে তিনটি বিষয় জড়িত। এক, ক্ষতিপূরণের সূত্র কী ভাবে স্থির করা হবে? যে জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে চাষ করে গেলে কতটা আয় হত, সেই হিসেব ঠিক ভাবে করা তো জরুরি বটেই। কিন্তু তার পরেও সমস্যা থেকে যায়। যেমন, নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পুরো টাকাটাই একবারে মিটিয়ে দেওয়া হলে সেই টাকার ভবিষ্যৎ মূল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক স্থির করার সময় অনুমান করে নিতে হয়, ভবিষ্যতে জিনিসপত্রের দাম কী হারে বাড়বে। কার্যক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির হার যদি তার চেয়ে কিছুটা বেশি হয় তা হলেই সে টাকার প্রকৃত মূল্য অনেকখানি পালটে যাবে। তা ছাড়া, জমিতে চাষ করে গেলে বছরের পর বছর কিছু কিছু আয় হয়ে চলত। ক্ষতিপূরণের টাকাটা একসঙ্গে দিয়ে দিলে সে টাকা উড়িয়ে দেওয়ার একটা আশঙ্কা থাকেই, বিশেষ করে দু'চার বছরের মধ্যে পরিবারের নারী ও শিশুরা মহাসঙ্কটে পড়তে পারে। মনে রাখা দরকার, অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পেলে কী ভাবে তা রাখতে হয় বা লগ্নি করতে হয়, কী করলে ভবিষ্যৎ আয় এবং ঝুঁকির মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা যায়, সে সব বিষয়ে একজন কৃষিজীবী মানুষ সচরাচর ওয়াকিবহাল হন না। তাই এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে আর্থিক ঝুঁকি বেশি হতে বাধ্য। আর একটা প্রশ্ন হল, অধিগৃহীত জমির ভবিষ্যতে যে দাম হবে বলে অনুমান করা যায়, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক স্থির করতে গিয়ে সেটা কত দূর হিসেবে নেওয়া উচিত, যাতে জমির বর্তমান মালিকরা এই ভবিষ্যৎ আয়ের ভাগ পেতে পারেন?

দুই, কে কে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য? যেমন, যাঁরা কোনও আইনি স্বত্ব না থাকলেও কার্যত জমির মালিকানা ভোগ করে আসছেন, তাঁদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হবে? অ-নথিভুক্ত বর্গাদার বা খেতমজুররা জমি অধিগ্রহণের ফলে জীবিকা হারাবেন। তাঁদেরই বা কী হবে?

তিন, ক্ষতিপূরণ মেটানোর প্রক্রিয়াটি কী হবে? এখানে আসল কথা হল আস্থা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। ভারতে নদীবাঁধ, সড়ক, খনি ইত্যাদি নানা প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ইতিহাস অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বহু কাহিনি, দালালদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার অগণিত ঘটনা সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। জমির বাজার অনেক

ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তদের দখলে, রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরে অনেক ক্ষমতাবান নেতার সঙ্গে সেই জমি-মাফিয়ার যোগসাজস থাকে বলে শোনা যায়। এই ধরনের নানান নেতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বর্তমান সরকার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতার আরও ক্ষতি করেছে। স্বভাবতই কৃষিজীবীরা জমি অধিগ্রহণ বা ক্ষতিপূরণের গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছেন, বিরোধীরা এই নিয়ে যা প্রচার করছেন সেটাই তাঁরা সত্য বলে ধরে নিচ্ছেন। তাঁদের আস্থা ফেরানোর একমাত্র উপায় হল, সরকারকে একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে এবং জমির বাজারে মুনাফা তোলার জন্য যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের থেকে নিজেকে অবিলম্বে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

পেনশন এবং

ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থার কথা ভাবা যায়, যাতে এই সব সমস্যা সমাধানের পথে অনেক দূর এগোনো যাবে। এই ব্যবস্থায় ক্ষতিপূরণের দুটি অংশ থাকবে। এক, ক্ষতিগ্রস্তরা একটি মাসিক পেনশন পাবেন, যে পেনশনের অঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির হার অনুসারে বদলাতে থাকবে। দুই, তাঁদের একটি সেভিংস বন্ড দেওয়া হবে, যা তাঁরা অল্প সময়ের নোটিসে ভাঙাতে পারবেন। (এর ফলে হঠাৎ টাকার দরকার হলে বিক্রি করার মতো একটি সম্পদ তাঁদের হাতে থাকবে, যেমন খুব প্রয়োজন হলে জমি বিক্রি করা যায়।) এর ফলে এককালীন ক্ষতিপূরণের আর্থিক ঝুঁকি অনেকটা এড়ানো যায়। এই ব্যবস্থায় জমি থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ আয়ের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের একটা সম্পর্ক তৈরি করাও সহজ হতে পারে। যেমন ধরা যাক, জমিতে যে শিল্প তৈরি হবে, ক্ষতিপূরণের কিছুটা টাকা দিয়ে সেই শিল্পসংস্থার শেয়ার কিনে রাখার সুযোগ দেওয়া হল। তার ফলে পেনশনের অঙ্ক সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থার মুনাফার উপর অংশত নির্ভর করবে। অথবা, ক্ষতিপূরণের কিছুটা অংশ এমন মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা যায়, যার রিটার্ন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জমি-বাড়ির দামের উপর নির্ভর করবে, অর্থাৎ ওই অঞ্চলের উন্নয়ন হলে সম্পত্তির দর বাড়বে, তার ফলে মিউচুয়াল ফান্ডটির আয় বাড়বে, তার সুফল ভোগ করবেন ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্ত মানুষ। অবশ্যই এই ব্যবস্থায় ঝুঁকি থাকবে। যাঁরা বাড়তি আয়ের আকর্ষণে ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। তাঁরা এমন পেনশন প্রকল্পে ক্ষতিপূরণের টাকা রাখতে পারেন যার আয় আগে থেকেই ঠিক করা থাকবে, কেবল মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেনশনের অঙ্ক বদলাবে।

আর, এ ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্বামী এবং স্ত্রী যদি টাকাটার সমান সমান ভাগ পান, তা হলে পরিবারকে বঞ্চিত করে অপব্যয়ের আশঙ্কা কমে।

কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কী ভাবে দেওয়া হবে, এ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলেও মূল প্রশ্নটি থেকে যায়: কে ক্ষতিপূরণ পাবেন, কে পাবেন না। এটা নিছক অর্থনীতি বা আইনের ব্যাপার নয়, এখানে নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতির বৃহত্তর প্রশ্নগুলিও এসে পড়ে। খুব সহজ করে ব্যাপারটা বলা যাক। ধরা যাক, আপনার একটি বাড়ি আছে, আপনি সেটি বিক্রি করতে চান। যে মেয়েটি গত কুড়ি বছর ধরে আপনার বাড়িতে কাজ করেছে, বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে কতটা আপনি তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবেন? যে জমির মালিক নয়, তাকে ক্ষতিপূরণের একটা অংশ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি খুব বড় পদক্ষেপ, কাজের মেয়েকে বাড়ি বিক্রির টাকার ভাগ দেওয়ার সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। লক্ষণীয়, আইনের চোখে ওই মেয়েটিরও আপনার বাড়ির উপর কোনও অধিকার নেই, এবং খোলা বাজারের নির্মম অর্থনীতি বলে যে, সে 'অন্য কোথাও' কাজ পেয়ে যাবে।

যার কোনও ধরনের আইনি স্বত্ব নেই, তাকেও ক্ষতিপূরণের দাবিদার হিসেবে স্বীকৃতি দিলে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেবেই। একটা উপায় হতে পারে যে, শুধু জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল, আর যাঁরা মালিক নন কিন্তু কোনও না কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁদের একটা বৃহত্তর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা হল। এটা ন্যায়সম্মতও বটে, এর ফলে ক্ষতিপূরণ নীতির অপব্যবহারের সম্ভাবনাও কমে যায়। (তা না হলে এমনও হতে পারে যে, কোনও জমি অধিগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলে কেউ ক্ষতিপূরণ আদায় করার উদ্দেশ্যেই সেই জমিতে খেতমজুর হওয়ার চেষ্টা করলেন।) মুশকিল হল, রাজ্যের সমস্ত দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালানোর সাধ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। একটা বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে, যে অঞ্চলে সরকার বড় আকারে জমি অধিগ্রহণ করবে, সেখানে একটা সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প চালু করা। পরিবর্তনের অভিঘাত সামলে নেওয়ার জন্য যত দিন দরকার হয় তত দিন, ধরা যাক তিন বছর, সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসী সমস্ত দরিদ্র মানুষকে কিছুটা টাকা দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থার একটা ত্রুটি এই যে, যাঁরা (জমি অধিগ্রহণের ফলে) নতুন দরিদ্র হয়েছেন তাঁরা বেশি সুযোগ পাবেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র তাঁরা কম। এ ধরনের সাময়িক সহযোগিতার যে কোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা থাকে।

চাই একটি স্বাধীন কমিশন

সবশেষে বলতে হয় বিশ্বাসযোগ্যতার কথা। যে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটা খুব বড় প্রশ্ন। যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে তা পূরণ করা দরকার, এটা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা জরুরি। প্রয়োজন একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কমিশনের। সেই কমিশন ক্ষতিপূরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাটির তদারকি করবে, তাকে এই তদারকির বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হবে। বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য এই কমিশনকে সরকারি প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা উচিত, এর কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগে সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না (যেমন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগে থাকে না), সরকারের কাছে যে কোনও দরকারি তথ্য চাওয়ার অধিকার তাঁদের থাকবে। পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনগুলি এই কমিশনের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মতামত জানাতে পারবে। সংবাদমাধ্যম গোটা ব্যাপারটির উপর নিরন্তর নজর রাখবে। বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এগুলো জরুরি।

এখন পশ্চিমবঙ্গে পারস্পরিক অনাস্থা এবং দোষারোপের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তাতে সরকারের প্রথম কাজ হওয়া উচিত যত শীঘ্র সম্ভব এই কমিশন নিয়োগ করা। যদি তা করা হয়, যদি সেই কমিশন তার প্রতিটি কাজে ও আচরণে নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে, তা হলে শিল্পায়নের গোটা উদ্যোগটার যে দুর্নাম হয়েছে, তা দূর হতে পারে।

নন্দীগ্রামে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল, তার পরিণামে যদি ক্ষতিপূরণের একটি উন্নততর মডেল তৈরি হয়, যে মডেলটি অন্য রাজ্যেও অনুসৃত হতে পারে, তা হলে হয়তো বলা যাবে, অনেকগুলি অমূল্য প্রাণের এই বলিদান সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়নি।

(শেষ)

***অশোক সঞ্জয় গুহ**, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়; **মৈত্রীশ ঘটক**, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স; **মৃণাল দত্ত চৌধুরী**, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স; **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; **প্রণব বর্ধন**, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, বার্কলে; **কৌশিক বসু**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **মুকুল মজুমদার**, কর্নেল ইউনিভার্সিটি; **দিলীপ মুখোপাধ্যায়**, বস্টন ইউনিভার্সিটি; **দেবরাজ রায়**, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি*